International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 36-45
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রবীন্দ্র নাটক ও ছোটগল্পে আশ্রয়ের সূত্রে প্রতিবাদ : এক অভিনব কৌশল

বিশ্বজিৎ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাউথ মালদা কলেজ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Context of shelter has been created in several dramas, short stories and poems of Rabindranath Tagore. In the present research paper, the researcher has chosen the subject of shelter and intends to show to what extent the shelter issue played a role in bringing about the completeness of the plot and establishing the thoughts and ideals of Tagore in these dramas, short stories and poems. It has been found that the characters who resorted to any shelter established themselves as a symbol of protest. They became rather the mover of the plot by their brilliancy of personalities.

Key Words: Shelter, Protest, Personality, Thoughts and Ideals of Rabindranath Tagore.

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে আশ্রয়ের স্বরূপ সন্ধান করলে তার সম্ভাব্য যেসব কারণগুলি আমাদের সামনে উঠে আসে সেগুলি হল— ১) সামাজিক (জাতিসত্ত্ব/ জাতিদাঙ্গা, সামাজিক বিন্যাস), ২) অর্থনৈতিক (দারিদ্র), ৩) ধর্মীয় (ধর্মভেদ ও হিংসা), ৪) রাজনৈতিক (আন্দোলন, দেশভাগ, রায়ট, দলগত চাপে গৃহহীন হওয়া), ৫) প্রাকৃতিক (বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, সুনামি, ধস ইত্যাদি), ৬) মনস্তাত্ত্বিক (মতাদর্শগত, বিপন্নতাবোধ), ৭) জনসংখ্যার আধিক্য, ৮) আবাসন সমস্যা, ৯) অনাথ দশা, ১০) ব্যক্তিগত (বৃদ্ধাশ্রম, Child home, Crech) ইত্যাদি। রবীন্দ্র নাটক এবং ছোটোগল্পের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যায় উপরে বর্ণিত সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে অনাথ দশাজনিত কারণের জন্য তাঁর বিভিন্ন চরিত্রেরা আশ্রয়ের সূত্রে বাঁধা পড়েছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে আশ্রয় গ্রহণের মূল কারণের সঙ্গে অবশ্যই নানা উপকারণগুলি সম্পৃক্ত থাকে। অনাথ দশার জন্য যে চরিত্র আশ্রিত হবে অবশ্যই তার অনাথ দশার পাশাপাশি, অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকবে। সেইসঙ্গে আশ্রয়দাতা বা আশ্রয়দাত্রীর প্রতি মতাদর্শগত বিশ্বাস বা প্রয়োজনে অবিশ্বাসের জন্ম হবে। রবীন্দ্র নাটক এবং ছোটগল্পে বিষয়টি নিছক ঘটনার সূত্রে আসেনি। কারণ সেই সব আশ্রিত চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে হয়তো বিশেষ কোনো আদর্শ বা মননকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তত্ত্ব, আদর্শ, মননকে প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্রিত চরিত্রগুলিকে নাটকে বা গল্পে করে তুলেছেন প্রতিকূলতা বা প্রতিপক্ষের বিপরীতে প্রতিবাদের মুখ। এদের মধ্যে যে কখনো সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠবে না তা নয়। তবে রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা অধিকাংশই আশ্রয়ের দেনা শোধ করে গেছে, মহৎ সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনন এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে কখনো পক্ষপাতদুষ্ট, কখনো তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিস্তৃত আলোচনা করে দেখা যাক সেখানে প্রতিবাদের সুর কোন দিক থেকে ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটকগুলিতে দেখা যায় নাট্যরস ঘণায়নে এবং কাহিনীর দ্বন্দ্বজাল মোচনে তিনি কিছু বালিকা চরিত্রের উপর নির্ভরতা দেখিয়েছেন। কখনো বালিকা এসেছে সরস্বতীর মূর্তি ধরে (‘বাল্মীকি-প্রতিভা’) কখনো প্রেমিকার মূর্তি ধরে (‘রুদ্রচন্ড’, ‘মায়ার খেলা’) কখনো মূল চরিত্রের বোধের আড়ষ্টতা দূর করতে (‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’) কখনো সত্য প্রেমের আদর্শে বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র নিয়ে (‘বিসর্জন’) আবার কখনো মানবপ্রেমকে বিশ্বধর্ম প্রেমের বোধে উন্নীত করতে (‘মালিনী’)। এদের মধ্যে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকের ম্লেচ্ছকন্যাটি সন্ন্যাসীর আশ্রিতা। সকলে যাকে ঘৃণাভরে হীনদৃষ্টিতে দেখে দূরে ঠেলে দিতে চায়। সন্ন্যাসী আকস্মিকভাবে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছে। নির্মোহ সন্ন্যাসী প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছে। সে বোঝে নি সসীমের মধ্যেই অসীম, ক্ষুদ্রকে নিয়েই বৃহৎ। আত্মকেন্দ্রিকতায় গুহার মধ্যে কঠোর কৃচ্ছাসাধনে সে বিশ্বের

সীমানাকে ভাঙতে চেয়েছে। বালিকা তাকে গৃহের দিকে টেনেছে। নাটকের মূলদ্বন্দ্ব তাই গৃহ বনাম গুহা। সন্ন্যাসী তার সাধনাকে সফল করতে বারবার বালিকার স্নেহাকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। অন্ধ গুহায় নির্বিকার যোগীর সাধনা যতই ঐকান্তিক হোক না কেন নাটকে সন্ন্যাসীর পরাজয় ঘটেছে। সে চিরতরে বেরিয়ে এসেছে গুহার জীবন থেকে। প্রকৃতির কাছে তার আত্মসমর্পণ বালিকারই জয়। কিন্তু ততক্ষণে বালিকা সকল স্নেহপাশ কাটিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। নাটকে তাকে আশ্রিতা বলার চেয়ে আশ্রয় প্রার্থনাকারিণী বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। গৃহে তার স্থান নেই কারণ সে ম্লেচ্ছকন্যা। গুহা সন্ন্যাসীর একান্ত নিজস্ব স্থান। তাই সেখানেও তার আশ্রয় মেলেনি। গুহাদ্বারে তার আশ্রয়ে স্পষ্ট হয়েছে, সে গুহা ও জগতের মিলনস্থল গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীকে পেতে চায়। সাধনার অন্ধতায় নিমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক সন্ন্যাসী তার পিতৃসম্বোধনের মর্ম উপলব্ধি করতে চায় নি। বালিকা প্রকৃতির কোলে মৃত্যুর শান্তিতে নিদ্রিত হলে গুহাচারী সন্ন্যাসীর ভুল ভাঙে। প্রকৃতির হাত থেকে নিদারুণ বিচার লাভ করে সন্ন্যাসীর তাই আক্ষেপ—

স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন — ওঠ মা ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন?
আয় রে বুকের মাঝে — এও তো পাষাণ।

সুতরাং সন্ন্যাসীর ভ্রান্ত সাধনার ভুল ভাঙাতে এবং জগৎস্রোতে তাকে নিয়ে আসতে বালিকার মৃত্যু এখানে নীরব প্রতিবাদের মাধ্যম। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী ফিরে এসেছে সীমার মধ্যে।

'রাজা ও রানী' (১২৯৬ বঙ্গাব্দে) নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কুমারসেনের আশ্রয় প্রসঙ্গের অবতারণায় যে নাট্যদ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটিয়েছেন তার একটি হল প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ সন্ধান। কুমার-ইলার অটুট বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ প্রেমের বিপরীতে বিক্রম-সুমিত্রার কর্তব্য ও আদর্শচ্যুত প্রেমচিত্রের অঙ্কন করেছেন। বিক্রমের অন্ধ প্রেম কামনার সুড়ঙ্গ পথে চলতে থাকে। রানী সুমিত্রা তাকে প্রজাপালনের মতো কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে নিজে দূরে সরে গিয়েছে। আর তাতেই বিক্রমের খন্ডিত অন্ধ প্রেম হিংসার রোষানলে সব কিছুকে দগ্ধ করতে চেয়েছে। তার অসংযত প্রবৃত্তি প্রেমের মঙ্গলময় মূর্তিকে চিনতে পারেনি। রাজার অখন্ড প্রতাপকে রানীর যে সব কাশ্মীরী আত্মীয়েরা খন্ড খন্ড করে ভাগ করে নিচ্ছিল, বিক্রম তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সংকলবদ্ধ হয়। যদিও এ দায়িত্ব পূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছিল সুমিত্রা এবং ভ্রাতা কুমারসেন। রাজার অপমানিত ক্ষত্রতেজ তাতে নতুন সংকল্প নেয়। জালন্ধরাজ বিক্রমের রোষানল থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাতে কুমারের পিতৃব্য মহারাজ চন্দ্রসেন স্ত্রী রেবতীর কুপরামর্শে আশ্রিত কুমারকে বিক্রমের হাতে তুলে দিতে চায়। আশ্রিত হলেও কুমারই কাশ্মীরের সিংহাসনের যোগ্য দাবীদার। পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সিংহাসন পুত্রেরই প্রাপ্য। চন্দ্রসেন স্ত্রীর পরামর্শে নিজ সন্তানের জন্য সিংহাসনের পথ সুরক্ষিত করতে এমন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমার সিংহাসনের জন্য লালায়িত নয়। তার সংকটের দিনে ইলার পিতা তাকে জামাতা হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ। অমরুরাজ আজ কন্যাকে বিক্রমের হাতে তুলে দিতে চায়। কুমারের কাছে সিংহাসন বাসনা থেকে ইলাকে প্রাপ্তির মূল্য অনেক বেশী। ইলার মনে আজও কুমারের জন্য যে বিশ্বাস-ভক্তির অটুট বন্ধন রয়েছে তা বিক্রমকে বিমোহিত করে। আজ তার কাছে স্পষ্ট হয় রানী রেবতীর ক্রূর হিংসার মুখ। চিত্তশুদ্ধ বিক্রম আজ কুমারকে ক্ষমা করে সিংহাসন বা ইলা-দুইকেই তার হাতে যোগ্য হিসাবে তুলে দিতে চায়। বিক্রমের চিত্তের এই পরিবর্তন কুমার জানে না। নিজের প্রেমদ্বন্দ্ব, সিংহাসনদ্বন্দ্ব, কাশ্মীরের নিরাপত্তা এবং সুমিত্রার ভাগ্যকে অনুকূল স্রোতে বইয়ে দিতে আজ সে সিদ্ধান্ত নেয় আত্মহত্যার। মৃত্যুতে আশ্রয়ের দেনা, জীবনের দেনা চুকিয়ে দিয়ে সে বিক্রমকে বুঝিয়ে দেয় প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ। পিতৃব্য চন্দ্রসেন এবং রেবতীর কাছে স্পষ্ট করে দেয় সিংহাসনটুকুর মধ্যেই তার আদর্শ সীমায়িত নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে পরার্থমূলক আত্মহননে সে খন্ডন করে আশ্রয়ের সূত্রটি। তার মৃত্যুর বেদনায় মূর্ছিত সুমিত্রাও মৃত্যুবরণ করে। একাধিক মৃত্যুদৃশ্যে রোমান্টিক-ট্র্যাজেডি নাটকটি পূর্ণতা পায়। ঘোষিত হয় প্রকৃত প্রেমের মঙ্গলধ্বনি। বিক্রমের এতদিনের বোঝবার বাধা দূর হল কিন্তু ততক্ষণে হারাতে হয়েছে— প্রিয়তমাকেও। প্রেম আর প্রিয়তমা—উভয়কে হারিয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ রাজা বিক্রম নতজানু হয়ে বিলাপ করে—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে?

আমরা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে দেখেছি যে প্রেম অসংযত তা ঋষিশাপে খন্ডিত হয় (অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্) তা দেবরোষে ভস্মীভূত হয় (কুমারসম্ভব), তা প্রভুশাপে নিররাসিত হয় (মেঘদূত)। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বিক্রমের অসংযত প্রেম, শেষে

প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজেছে। আশ্রতি চরিত্র কুমারের আত্মবিসর্জনে নাট্যকারকে সে পথ খুঁজতে হয়েছে। বিক্রমের প্রেমের অন্ধতা ও মূঢ়তাকে প্রতিবাদ জানাতে ব্যবহার করতে হয়েছে আশ্রিতের আত্মবিসর্জনের মহৎ পন্থাকে।

পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি নাটক 'বিসর্জন'এ নাট্যকার বৌদ্ধধর্মের অহিংস তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশে নাটকে তিনি বহুদিনের প্রচলিত একটি প্রথার অজ্ঞতাকে প্রতিবাদ করেছেন। সে প্রথা হল মন্দিরে বলিপ্রথা। জীববলি বন্ধ করার ঘোষণামাত্রেই নাটকে কতগুলি বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সেগুলি হল ব্রহ্মতেজ বনাম হৃদয়ধর্ম, প্রেম বনাম প্রতাপ, বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস। এইসব দ্বন্দ্বের যথার্থ মীমাংসায় নাটকে নিয়ে আসতে হয়েছে আশ্রিত চরিত্র জয়সিংহকে। দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরে জীববলি দেখে অভ্যস্ত জয়সিংহের মনে এই প্রচলিত প্রথা নিয়ে প্রথমে কোন সন্দেহ দেখা যায় না। বরং পালকপিতা রঘুপতির প্রতি অন্ধ-আনুগত্যতায় সে তাকে সমর্থন করে গেছে। ক্ষুদ্র বালিকা অপর্ণা ভিখারিণী বেশে মন্দিরে প্রবেশ করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেলে জয়সিংহের মন নাড়া খেল। সে বুঝলো এতদিনের কত বড় অন্যায়কে সেও মেনে এসেছে। বিশ্ব মায়ের পূজা প্রেমের দ্বারাই সম্ভব, হিংসার দ্বারা নয়। পালকপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তার অন্যায়কে সরব প্রতিবাদ জানানোর মানসিক দৃঢ়তা তার নেই। অথচ অপর্ণার আহ্বানে মন্দির ছেড়ে যেতে চায় সে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বলিপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির ব্রহ্মতেজ অপমানিত বোধ করে। সে আত্মপক্ষের জয় নিশ্চিত করতে ছলনা, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার আশ্রয়ে শক্তি সঞ্চয়ে মন দিয়েছে। রাণী গুণবতীকে সে আশ্বস্ত করেছে, রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনের প্রলোভন দিয়ে নিজের দিকে নিয়ে এসেছে। প্রজাদেরকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করতে প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। পালিতপুত্র জয়সিংহকে আশ্রয়ের ঋণ শোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে নাটকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তা রাজা বনাম রানী, রাজা বনাম ভ্রাতা, রাজা বনাম প্রজা এবং নিজের সঙ্গে পালিত পুত্রের মধ্যে দেখা যায়। রঘুপতির অন্যায় চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র দেখে পালিতপুত্র হিসাবে জয়সিংহ ব্যথাহত হলেও মুখোমুখি প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। প্রতিমার আড়াল থেকে পিতা রাজ্যের প্রজা এবং জয়সিংহকে শুনিয়েছে-দেবী রাজরক্ত চায়। এরপরই জয়সিংহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে রাজরক্ত সে নিয়ে আসবে, ভ্রাতৃহত্যা হতে সে দেবে না। এজন্য দেবতা-গুরু সব অথরিটি থেকে মুক্তি পেতে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। জন্মসূত্রে ক্ষত্ররক্ত তার দেহেও প্রবাহিত। তাই শ্রাবণের শেষ রাতে জীবনের খাতায় শেষ দাড়ি টেনে দিয়েছে সে। হৃদয়ের সকল সংশয়-অসংশয়কে আত্মবিসর্জনে সে মুছে দিলে রঘুপতির বোঝবার বাধা দূর হয়। সে আজ প্রাণপ্রিয় জয়সিংহকে হারিয়ে উপলব্ধি করতে পারে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা কতো বড় জিনিস। তাকে আঘাত করলে কত বেদনা। বদ্ধ সংস্কারে আবদ্ধ থেকে সে তার ব্রহ্মতেজ ও পুরোহিত ধর্মকে জয় দিতে গিয়ে নানা ক্রূর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। রাজার পালিতপুত্র ধ্রুবকে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুর পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাজার তৎপরতায় ধ্রুব রক্ষা পেল। রাজপুরোহিত এবং রাজভ্রাতা দুজনে এ ঘটনার জন্য নির্বাসন দন্ড ভোগ করবে। কিন্তু নির্বাসনে যাবার পূর্বে সে দেখে যেতে চায় ব্রহ্মতেজের জয়। পালিতপুত্র তাকে কথা দিয়েছিল দেবীর জন্য রাজরক্ত সে নিজে নিয়ে আসবে। সে সত্য পালনের সময় আসীন হলে জয়সিংহ আপন বুকে ছুরি বিন্ধনে হৃদয়দলনী পাষানীর পাপতৃষ্ণা নিবারণ করে। স্নেহাস্পদকে হারিয়ে রঘুপতির চেতনার পথ পরিষ্কার হলে সে দূরে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করে প্রতিমাকে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে কোথাও সে ছিল না কোনোদিন। জয়সিংহের মৃত্যুতে সে বুঝলো অপর্ণার কাছে বলিপ্রদত্ত ছাগশিশুর প্রাণও কত সত্য ছিল। রঘুপতির প্রতিমা বিসর্জন বাইরের একটি বিষয়মাত্র। তার পূর্বে আর একটি মহৎ বিসর্জন ঘটে গেছে তার হৃদয়ে। তা হল বলি প্রসঙ্গে তার অন্ধ অজ্ঞতা। জয়সিংহের জীবনে সকল বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আনুগত্য বিদ্রোহ জট পাকিয়ে মুক্তি খুঁজেছে মৃত্যুতে। আসলে নিজের অভিজ্ঞানকে স্পষ্ট করে তুলতে এছাড়া তার পথ নেই। তার মৃত্যুর প্রতিবাদের ধ্বনিতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বসংগীত। প্রমাণিত হয়েছে প্রেমের কাছে অহংকার, দেবতা, ব্রাহ্মণ, অভিমান—সব মিথ্যা। রঘুপতি হার মেনে নিলে নাটকে জয়ী হয়েছে প্রেম আর হার মেনে নিয়েছে প্রতাপ। আর এই নাট্যদ্বন্দ্বের মীমাংসায় আত্মবিসর্জনের নীরব প্রতিবাদের ধ্বনি সঞ্চার করে আশ্রিত জয়সিংহ হয়েছে নাটকের মূল আদর্শ চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা' নামক প্রহসনটিতে প্রেমসংক্রান্ত বিষয়কেন্দ্রিক প্রাথমিক ভ্রান্তিকে উজ্জ্বল হাস্যে বর্ণনা করেছেন। এই উদ্দেশে নাটকে যে আশ্রিতা চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে তার মাধ্যমে প্রতিবাদের বিশেষ সুর কিছু ধ্বনিত হয়নি। বাস্তবিক হাস্যরসের নাটকের ক্ষেত্রে তা খুব একটা সম্ভব হয় না। নিবারণের আশ্রিতা আদিত্যবাবুর কন্যা কমলমুখীর আচরণে যতটুকু প্রতিবাদের সুর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হল পুরুষশাসিত সমাজে স্বামীর খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে হৃদয়ের গুণে আর মহত্বের পরিচয়ে স্বামী বিনোদবিহারীকে স্ত্রীধনের মূল্য সম্পর্কে শিক্ষাদান। কবিপ্রাণ খামখেয়ালি মানুষ বিনোদবিহারী কমলমুখীকে বিবাহের পরই দারিদ্র্যের অজুহাতে স্ত্রীকে নিবারণবাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেন। এরপর আশ্রিতা কমলমুখী আকস্মিকভাবে পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে স্বামীর সকল দুশ্চিন্তা দূর করে যেভাবে স্বামীর হৃদয়ের ধনে পরিবর্তিত

হয়েছে সেই কাহিনী নাটকে বর্ণিত হলেও তা মূল কাহিনী নয়। মূল কাহিনী হল ইন্দুমতী-নিমাইয়ের ভ্রান্তি। কাদম্বিনী এবং ললিত নামে তারা পরস্পরের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই কাদম্বিনীকে নিমাই ভালোবেসেছে। আবার এই ললিতকে ভালোবেসেছে ইন্দুমতী। বাস্তবিক তাদের এই ভ্রান্তি নাটকে দূর করতে হয়েছে কমলমুখীকে। কমল তাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে তাদের মনে জন্ম নেওয়া পারস্পরিক ভ্রান্তিকে ভেঙে দিয়েছে। তারা উভয়ে উভয়কে ভালোবাসে। তবে ভিন্ন ভিন্ন নামে মাত্র তারা পরস্পরের হৃদয়ে অবস্থান করেছে। এ ভুল ভেঙে গেলে গোড়ায় গলদ শেষরক্ষা পায়। অভিভাবক নিবারণ এবং শিবচরণের মনের দুশ্চিন্তাও তাতে দূর হয়। এই সামান্য বিষয়টিকে হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশনায় নাট্যকার নাটকে আশ্রিত চরিত্র হিসাবে কমলমুখীকে কাহিনীতে সংযোজিত করেছেন। নাটকের মূল দ্বন্দ্বের মীমাংসায় কমলের ভূমিকা যেমন স্বতন্ত্র তেমনি নিজের সঙ্গে স্বামীর বিচ্ছেদের সমস্যাটিকে মীমাংসা করতে সে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, উদারতা এবং নমনীয়তায় পরিচয় রেখেছে তাতে পুরুষ প্রধান সমাজে স্ত্রীর অবহেলা, পুরুষের মর্জিমাফিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়ের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম কিছু প্রতিবাদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা স্ত্রীর ভূমিকায় নাটকে সে জয়ী হয়েছে। আর তাতে নির্ধারিত হয়েছে স্ত্রীধনের মূল্যও।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'বিদায় অভিশাপ' (১৩০১) নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রেমের ঊর্ধে কর্তব্য ধর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী নামক দুর্লভ বিদ্যা অর্জনের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ সহস্র বছরের জন্য শুক্রাচার্যের আশ্রয় লাভ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে কচ দেবযানীর অন্তরে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবযানীর জন্য তার হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল। বিদায়লগ্নে কচকে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে দেবযানীর সকল প্রচেষ্টাকে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্যতা দিলেও বৃহত্তর স্বার্থের লক্ষ্যে কর্তব্যসাধনের মন্ত্রে নিজের প্রণয়কে গৌণ বলে ধরে নিয়েছে। দেবযানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের প্রণয়কে হৃদয়ে লুকিয়ে সে স্বর্গের পথে পা বাড়ালে শুক্রকন্যা তাকে অভিশাপ দিয়ে বসে। দেবযানীর কথোপকথনে স্পষ্ট তার দাবী অনৈতিক নয়। আবার কচের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় অভিশপ্ত হলেও স্বর্গে প্রত্যাগমন তার অবশ্য কর্তব্য। হৃদয়ের মহত্ত্বে অভিশাপ প্রদানকারিণীকে অভিশাপ না দিয়ে সে আশীর্বাদ করে —

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

এই অংশে আমরা মহাভারতের ঘটনার বৈপরীত্য লক্ষ্য করি। আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন ব্যক্তিগত প্রেমের ঊর্ধে কর্তব্যের নিষ্ঠাকে উচ্চে আসীন করতে। দেবযানীর প্রেম, সেবা, সাহচর্য তাই কচের কাছে অমূল্য হয়েও বৃহত্তর গোষ্ঠীস্বার্থের প্রশ্নে তা স্বীকৃতি পায় নি। কচের জীবনে দেবযানী অধ্যায়ের সকল স্মৃতি শৈলশিখরদেশের সূর্যপ্রভাব মতো উজ্জ্বল থাকবে। অথচ কর্তব্যের প্রশ্নে তাকে খন্ডন করে সে চিরকালের জন্য সেসব স্মৃতির বাহক হয়ে বেড়াবে। রবীন্দ্রমননকে জয় এনে দিতে তাই আশ্রিত চরিত্রের কোনো প্রতিবাদের ধ্বনি ধ্বনিত হয় নি। বরং প্রতিবাদ যা সবই দেবযানীর। কচ সেখানে কেবল আশ্রিত চরিত্র হিসাবে আত্মগোষ্ঠীর স্বার্থ সাধনের একটা মাধ্যম। তার কর্তব্যের আদর্শ কবির কাছে প্রশংসিত বিষয় হলেও পাঠকের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

স্ত্রী চরিত্রের সংলাপবর্জিত তিনটি দৃশ্যের ক্ষুদ্রকায়া প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০২)। নাটকটি অনাবিল হাস্যরসের নাটক নয়। নাটকটির মূলরস করুণার ও মাধুর্যের। হাস্যরস এখানে যেন সঞ্চারী রস মাত্র। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার কয়েকটি সুযোগসন্ধানী চরিত্রের আংশিক আশ্রয়চিত্রের অঙ্কন করেছেন। বৈকুণ্ঠের ভ্রাতা অবিনাশের বিবাহের পূর্বে তাদের গৃহে বন্ধু কেদার এবং ছায়াসঙ্গী তিনকড়ির আশ্রয় জুটেছিল। কেদারের কৌশলে মনোরমার সঙ্গে অবিনাশের বিবাহের পর সেখানে নতুন আশ্রিত হিসেবে কেদার, তিনকড়িদের সঙ্গে জুটেছে ছোটবউয়ের খুড়ো বিপিন এবং কেদারের পিসি। আশ্রয়দাতা বৈকুণ্ঠ বা অবিনাশের দুর্বলতা তাদের বাতিক। অসংসারী বৈকুণ্ঠের বাতিক লেখা এবং প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করা। আর অবিনাশের বাতিক গাছপালা এবং মনোরমাকে বিয়ে করার ঐকান্তিকতা। দুই ভাইয়ের এই বাতিকগুলোকে যথাযথভাবে নিজেদের আশ্রয়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে কেদারের দল। কখনো বৈকুণ্ঠের রচিত সাহিত্য শোনার মিথ্যা আগ্রহ প্রকাশ করে আবার কখনো অবিনাশকে প্ররোচিত করে মনোরমাকে বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কেদার বা তিনকড়ির এই ছলনা, প্রবঞ্চনার কারণ নিজেদের উদরপূর্তি। অবিনাশের বিবাহের পর নতুন যারা আশ্রিত হয়ে আসে তাদের মধ্যে ছোটবউয়ের খুড়ো বিপিনের যন্ত্রনায় গৃহকর্তা বৈকুণ্ঠের প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্য আশ্রিত কেদারের পিসির নির্যাতনের বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নীরু নানা অত্যাচারের শিকার। আপন ভাইয়ের আত্মীয়দের কথা ভাইকে নালিশ করে বৈকুণ্ঠ ছোট হতে চায় না। বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর ঈশানের চোখে এইসব আশ্রিতদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মাঝে মাঝে সে তাদের জবাব দিতে ভোলেনি।

এহেন ঈশানকে সংযত করতে বৈকুণ্ঠ কখনো কখনো নিজে দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। নীরবে কন্যাকে নিয়ে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্তিম সময়ে সব ঘটনা জ্ঞাত হয়ে অবিনাশ দাদার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তকে রোধ করেছে। নিজগৃহে বৈকুণ্ঠ এবং তার কন্যা, আশ্রিতদের কাছ থেকে যে জ্বালাতন সহ্য করেছে তাতে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলে নাটকটি কোনমতে প্রহসন হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে না। অবিনাশ শেষ পর্যন্ত সকল আশ্রিতদের বাড়ী থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে নাটকটি শেষ পর্যন্ত আর করুণ পরিণতির হয়নি। এদের মধ্যে তিনকড়ি যেন খানিকটা মন্দের ভালো। সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে তিনকড়ির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন —

> *'উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য সে কেদারের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেদারের নীচ কাজে সাহায্যও করিয়াছিল, কিন্তু অন্তর তাহার কলুষিত হয় নাই, — বাহিরের নোংরা কাজ তাহার হৃদয়ের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত স্পষ্ট বাদী, কেদারের লোভ ও স্বার্থবুদ্ধি তাহার মধ্যে নাই। বৈকুণ্ঠের উদার স্বভাবের জন্য তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ছিল, তাহাকে সে ভালোবাসিত।'*

এই বিবেকবোধটুকুর জন্য সে সর্বদা কেদারের হাতে পড়া বৃদ্ধের জন্য দুশ্চিন্তা করেছে। ধূর্ততায় সে কেদারকে বশ মানায়। নইলে কেদারের মতলবকে আগে থেকে অনুধাবন করতে পারত না সে। ধূর্ত হলেও আশ্রয়দাতাদের প্রতি কিছু দুর্বলতা তার ছিল। আশ্রয়দাতাদের উদারতা, সারল্য এবং ভালোমানুষীকে নির্বিকার চিত্তে ব্যবহার করার মতো পাপিষ্ঠ সে নয়। সে বোঝে বৈকুণ্ঠকে ফাঁকি দিলে অধর্ম হবে। এই ভাবনা কেদার, বিপিন বা পিসির নেই। তারা সুযোগের ব্যবহার করে দুহাত ভরে কেবল নিতে জানে। যার অনুগ্রহে বেঁচে তাকে বিড়ম্বনায় ফেলতে তাদের বাধে না। আশ্রিত হিসাবে কোন হীনবোধ বা দুর্বলতা তাদের নেই। বরং মনে করে যা পাচ্ছে তার অধিক পাওনা তাদের। এমন অকৃতজ্ঞের দল শেষপর্যন্ত বিতাড়িত হলে আশ্রয়দাতারা নিশ্চিন্ত হয়। রবীন্দ্রনাটকে অনেক আশ্রিত চরিত্রের আলোচনা করছি এবং অনেক আশ্রিত চরিত্রের আলোচনা সামনে করা হবে কিন্তু আলোচ্য নাটকের আশ্রিতদের মতো এমন নীচ, আহাম্মক আর নেই। রবীন্দ্রনাথ তাদের কণ্ঠ কোন প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। বরং তাদের অত্যাচারে সরলমন, উদার আশ্রয়দাতার নাকাল হবার মর্মান্তিক দৃশ্যই নাটকে অঙ্কন করেছেন।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' (১৩০৬) শীর্ষক যে নাট্যটি রচনা করেছেন সেখানে ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণের আশ্রয় প্রসঙ্গের চিত্রটি বর্ণিত আছে। যদু বংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা কুন্তী অতিথি দুর্বাসাকে সেবায় তুষ্ট করে এক অমোঘ মন্ত্র লাভ করেন। যার শক্তিতে তিনি যে কোন দেবতাকে আহ্বান করে তার প্রসাদে পুত্র লাভ করতে পারবেন। কৌতূহলবশে কুমারী কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করে কানীন পুত্র হিসাবে কর্ণকে লাভ করেন। এরপর কলঙ্ক এবং লোকলজ্জার ভয়ে তিনি তাকে কবচ-কুন্ডল সহ অবজ্ঞার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনা বড় কম নয়। সে সূতপুত্র বলে দ্রোণাচার্যের কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি, পরশুরামের কাছে ছদ্মপরিচয়ে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে অভিশপ্ত হয়েছে, ব্রাহ্মণের গো-হত্যা করে অভিশপ্ত হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় বীরত্ব প্রদর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এমনকি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম না হওয়ার অপরাধে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা পেয়েছে। অথচ তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলেছে সেই দ্রোণ, কৃপ বা পান্ডবদের জন্মকাহিনীও কলঙ্কশূন্য নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সে দুর্যোধনের সঙ্গী। তার বীরত্বে ভীত হয়ে পূর্বেই ইন্দ্র কৌশলে তার কবচ-কুন্ডল হরণ করেছিল। যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে জন্মদাত্রী মা কুন্তী তাকে পান্ডবশিবিরে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। কুন্তী তাকে আপন অধিকারে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার প্রলোভন দিয়েছে। অধিরথ-রাধাকে পিতামাতা হিসাবে মেনে নিতে তার কুণ্ঠাবোধ নেই। কিন্তু জন্মদাত্রীর স্নেহাতুর আকর্ষণে এক মুহূর্তের জন্য হলেও সে দুর্বলতা অনুভব করেছে। আপন বীরধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে সে পারবে না। আবার মায়ের স্নেহাকর্ষে তার অন্তরাত্মাও জেগে উঠেছে। প্রবল দ্বন্দ্বমথিত হয়ে মাকে তার আজকের ভাগ্যের জন্য দায়ী করে কিঞ্চিৎ অনুযোগ জানাতে সে ভোলে নি। চরম অভিমানমিশ্রিত সুরে সে বলে—

জয়ী হোক, রাজা হোক পান্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।

মাকে সে ফিরিয়ে দিলেও পান্ডবদের জয় নিশ্চিত করেছে। বিশ্বসংসারে বিধির প্রথম দান মাতৃস্নেহ। সেই দেবতার ধন থেকে সে জন্মমুহূর্তেই বঞ্চিত। তাই সিংহাসন সম্পদের লোভ আর কাছে গৌণ বিষয়। মায়ের আহ্বানে সাড়া দিলে বন্ধু দুর্যোধনের প্রতি অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন হতে হয়, তার কর্তব্যবোধ প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়। সর্বোপরি তার বীরধর্ম ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাকে স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী বলে চিহ্নিত করে। মাকে সে কথা দিয়েছে অর্জুন ব্যতীত আর কাউকে সে হত্যা করবে না। নাটকের কাহিনী আরো প্রলম্বিত হলে আমরা ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণের মৃত্যু দেখতাম কুরুক্ষেত্রে। দেবতা-মানুষের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের

বিরুদ্ধে বিপর্যস্ত বীরের করুণ পরিণতি দেখতাম। এখানে তাকে যতটুকু দেখা গেছে তাতে তাকে মায়ের বিরুদ্ধে চরম এক অভিমানী যুবক হিসাবে দেখা যায়। প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে মহাভারতে তার অবস্থান যত্রতত্র। আলোচ্য নাটকে তার প্রতিবাদের ধ্বনি সোচ্চার হয়েছে মায়ের অবজ্ঞার বিরুদ্ধে। নিজের অপরাধে মা তাকে নির্বাসন দিয়েছিল। সেই মর্মজ্বালা নিয়ে মাকে সে চরম অভিমানে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের বীরধর্ম এবং ক্ষাত্রতেজকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' (১৩১৫) নাটকখানি রচনা করেন। নাটকটি রচনার তেরো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে 'ঋণশোধ' নামে পুনরায় রচনা করেন। নাটকের মূল বিষয় জগৎ আনন্দের ঋণশোধ যেমন সত্য তেমনি সত্য উপনন্দের গুরুঋণ শোধ। বীণাচার্য সুরসেনের অকালপ্রয়াণের পর গুরুর আশ্রিত নীচকুলোদ্ভব উপনন্দ লক্ষেশ্বরের কাছে গুরুর অপরিশোধিত ঋণ শোধ করতে একাগ্র চিত্তে পুঁথি নকল করে চলে। একদিকে সকলে যখন ছুটির আনন্দে প্রাণের খেলায় মেতে উঠছে উপনন্দ তখন কর্তব্যের কঠিন বন্ধনে ঋণশোধের চিন্তায় নিমগ্ন। নাটকে যে বিষয়গুলি প্রধানত প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হল —

১) বিত্তবাসনা (লক্ষেশ্বর) বনাম আসক্তিহীনতা (মহারাজ বিজয়াদিত্য, উপনন্দ, ঠাকুরদা)
২) স্বার্থহীন আনন্দময় শারদোৎসব (বালকগণ, ঠাকুরদা ও বিজয়াদিত্য) বনাম ব্যক্তিগত হীন স্বার্থপূরণ (লক্ষেশ্বর, সোমপাল)
৩) দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মবাদ (বিজয়াদিত্য, ঠাকুরদা)
৪) কর্তব্যবোধ (উপনন্দ এবং বিজয়াদিত্য)

লক্ষেশ্বর দুর্নিবার ধনপিপাসায় অন্ধ হয়ে মহারাজ বিজয়াদিত্যের শারদোৎসবে বের হবার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারে নি। মহারাজের সামন্ত সোমপালও তার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির হীনস্বার্থ সিদ্ধির সাধনা করে। শেষে ছদ্মবেশী বিজয়াদিত্যের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনে তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না। সন্ন্যাসী (ছদ্মবেশী বিজয়াদিত্য) এবং ঠাকুরদার আধ্যাত্মিক আলোচনায় বোঝা যায় - দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন সমান হয়ে যায় যখন, তখনই মিলনটি হয় সুন্দর এবং পরিপূর্ণ। সন্ন্যাসী শিক্ষা দিয়ে গেলেন রাজা হতে গেলে আগে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। বিজয়াদিত্যের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হলে সামন্ত সোমপালের স্বীকারোক্তি —

> *'মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারতো না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবটি আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।'*

নাটকের শেষে সকলে তার যথার্থ প্রাপ্য পেয়েছে। লক্ষেশ্বর পেয়েছে সম্পদ, সোমপাল পেয়েছে রাজ্য শাসনের যথার্থ শিক্ষা, ঠাকুরদা পেয়েছে রাজার যোগ্য সখ্যের মর্যাদা। আর নিরাশ্রয় উপনন্দ পেয়েছে রাজার সন্তান হিসাবে রাজপ্রাসাদে আশ্রয়। রাজা স্বীকার করেন সন্ন্যাসধর্মের জোরে নিঃসন্তান তিনি এই সন্তানটি লাভ করলেন। নীচ কূলে জন্ম হবার জন্য যে হীনতাবোধ তার অন্তরে ছিল আজ থেকে তা মুছে যাবে। রাজা তার কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সন্তানের স্বীকৃতি দান করেন। নিজে তার কাছ থেকে শিখেছিলেন — শত দুঃখের দলে সাধনার তাপসবেশ কী হবে। প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে সেও সামিল হয়েছে। তবে অন্যদের মতো বাইরের আনন্দে নয়। কর্তব্যের ঐকান্তিকতায় অন্তরের আনন্দে। ফলে জগৎ আনন্দের ঋণশোধের মতো সত্য হয়েছে উপনন্দের প্রচেষ্টাও।

রবীন্দ্র নাটকে আশ্রিত চরিত্রদের কর্তব্যবোধে কচ পেয়েছে প্রিয়তমার অভিশাপ, কর্ণ পেয়েছে বীরের খ্যাতি আর উপনন্দ পেয়েছে রাজার সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি। নাটকে আশ্রিত উপনন্দের যে প্রতিবাদ তা আসক্তিহীন ও নিঃস্বার্থ কর্তব্যের মহামন্ত্রে স্বার্থান্বেষী বিত্তভোগীদের বিরুদ্ধে সুন্দরকে জয় করার শিক্ষা। এই শিক্ষা লক্ষেশ্বরেরা লাভ করতে পারে না বলে চিরকাল স্বার্থ ও সম্পদের সংকীর্ণ গণ্ডী তাদের পিষে মারতে থাকে।

শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের একটা nervous breakdown হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ দিনরাত মরবার একটা ইচ্ছা তাঁকে তাড়না করে বেড়াত। শিলাইদয় থেকে ফিরে পূজার ছুটির পর শান্তিনিকেতন অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ডাকঘর' (১৩১৮) নাটকখানি রচনা করেন। নাটকের আশ্রিত চরিত্র বালক অমলের আশ্রয় লাভের পথটি মসৃণ ছিল না। বিষয়নিষ্ঠ মাধব দত্ত রাজী না থাকলেও তার সন্তানহীনা স্ত্রী পোষ্যপুত্র নেবার জন্য ক্ষেপে উঠলে তিনি আর না বলতে পারেন নি। পিতৃমাতৃহীন গ্রাম্য বালকটি তার দূর সম্পর্কের গ্রাম্য পরিচয়ের পিসিমার গৃহে আশ্রয় পেলেন। ক্রমে মাধব দত্তের মনে ছেলেটি নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে। আজ সে অনুভব করে টাকা রোজগারের নেশাটা তার অর্থহীন হবে না। সে তার

উপার্জিত সম্পদকে ছেলেটির হাতে দিয়ে যেতে পারবে। তার মানসিক কিছু পরিবর্তন এলেও বিষয়চিন্তা থেকে তার মন কখনো সরে আসে নি। শেষ দৃশ্যে তাই রাজার আগমনের বার্তা শুনে অমলকে শিখিয়ে দেয় - কিছু চেয়ে নিতে। নাটকটি যখন রচিত হয় তখন কবিহৃদয় খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বে বিশ্বদেবতার সৃষ্টি সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক লীলায় মগ্ন। শিশু অমল যেন সেই লীলারই প্রকাশক। ঘরের বাঁধন কাটিয়ে বিশ্বদেবতার চিরন্তন লীলা নিকেতনে যাবার ডাকে সাড়া দিতে তাই বিশ্বদেবতার ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাটকে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই ভগবানের অনাদি কালের রূপের প্রকাশ। অনাবিল অন্তরাত্মা না থাকলে সেই অসীম প্রেমময়ের কাছে পৌঁছানো যায় না। স্বপ্নবিলাসী বালক কখনো পন্ডিত হয়ে ঘরেবদ্ধ থাকার স্বপ্ন দেখে না। সে চায় নাগরাজুতাওয়ালা পথিকের মতো কাজ খুঁজতে। কখনো চায় শ্যামলী নদী তীরস্থ, পাঁচমুড়া পাহাড়ের নিকটস্থ গ্রামের দইওয়ালা হয়ে দই বেচতে। আবার কখনো চায় রাজার ডাকহরকরা হয়ে দেশে দেশে চিঠি বিলি করতে। তার এইসব অদ্ভুত আজগুবি স্বপ্নে কবিরাজ বা মাধব দত্ত অধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আশ্রিত বালক হলেও নিঃসন্তান দম্পতির ভবিষ্যতের ভরসাস্থল সে। কিন্তু তার চোখে মুখে ফুটে উঠতে থাকে মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। শেষ লগ্নে বিশ্বেশ্বর সত্যিই আসে তার কাছে। জগৎময় বিশ্বদেবতার আনন্দময় অমৃতরূপের যে প্রকাশ, তার স্বরূপ যার কাছে যথার্থ উপলব্ধ হয় বিশ্বেশ্বর তার কাছে না এসে পারে না। নাটকে তার সংলাপে যে ব্যঞ্জনা তা অবিশাস্য। কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। 'সময় কেবলই চলে যাচ্ছে' যে দেশে সেই দেশে যেতে অমলের মন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। ক্রমে রাজা এল। তার ডাকঘরের ডাকহরকরা একদিন অমলের জন্য চিঠিও এনেছিল। রাজদূত এল আজ রাজাকে সঙ্গে নিয়ে। অমল আজ মৃত্যুর মুক্তিতে বিশ্বদেবতার অপার রহস্যলোকে প্রবেশ করবে। আজ অমলের জন্য সুধা ফুল এনেছে। তবে ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। অমল বিশ্বেশ্বরের ডাকঘরের চিঠিতে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে ছুটে চলেছে। নাটকের মূল বিষয় মানবাত্মা অমলের বিশ্বাত্মা রাজার সঙ্গে মিলিত হবার সাধনা। 'ডাকঘর', 'ডাকহরকরা', 'ঘন্টা', 'চিঠি' সবকিছু এখানে সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় উপস্থিত হয়েছে। আসলে সমগ্র বিশ্বটি অনাদি রাজার এক ডাকঘর। বালকের জ্ঞান পরিধিতে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিস্থাপনে নাটকে তা অমলের জানালার সামনে বসাতে হয়েছে। ডাকহরকরা রাজ আজ্ঞার বার্তাবাহক। চিঠি হল জীবাত্মা-বিশ্বাত্মার মিলনের ডাক। আর ঘন্টাধ্বনি হল রহস্যলোকে প্রবেশের সংকেত। নাটকের মূল বিষয় - বিষয়বাসনা বনাম বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য পিপাসা এবং জীবাত্মা-বিশ্বাত্মার মিলন। এই দুইটি বিষয়ের সংঘটনে নাট্যকার আশ্রিত অমলকে রেখেছেন কেন্দ্রবিন্দুতে। নাটকে তার সুদূরের পিপাসা, বিশ্বরহস্য ভোগের দুর্নিবার বাসনা ও রাজার চিঠ পাবার উৎকণ্ঠা আসলে সংকীর্ণ বিষয় বাসনার বিরুদ্ধে চিরন্তন জীবনস্রোতে সামিল হবার এক অনিবার স্বপ্ন । এই স্বপ্ন তার বাস্তবায়িত হয়। আর সেই পথে নীরব প্রতিবাদ রেখে যায় বিষয়বোধের অন্ধতার বিরুদ্ধেও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুবছর পর রচিত 'মুক্তধারা' নাটকে নাট্যকার যে বিষয়গুলিকে আমাদের সামনে এনেছেন সেগুলি হল— ১) যন্ত্র বনাম মানুষ (বিভূতি-অভিজিৎ), ২) উগ্র জাতীয়তাবাদ (উত্তরকূটের প্রজা বনাম শিবতরাইয়ের প্রজা), ৩) শক্তি বনাম মুক্তি (বিভূতি-রণজিৎ বনাম অভিজিৎ, ধনঞ্জয়, বিশ্বজিৎ, সঞ্জয়), ৪) বাঁধ বনাম পথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন পশ্চিমদেশীয়দের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উগ্র জাতীয়তাবাদ। দেখেছেন বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক রূপকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কীভাবে ক্রুদ্ধ আস্ফালন করে উঠছে। আলোচ্য নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন সে বিষয়গুলির প্রতিবাদ করেছেন। নাটকে এই প্রতিবাদ এসেছে প্রধানত অভিজিতের মাধ্যমে। দাদামশাই মোহনগড়রাজ বিশ্বজিতের আদর্শে প্রাণের মধ্যে সে যে অফুরান শক্তির উন্মাদনা লক্ষ্য করে তার জোরে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তার ভয় হয় না। শিবতরাইয়ের দায়িত্ব হাতে পেয়ে সে তাদের দুবছরের খাজনা মুকুব করেছে। বাণিজ্যের সুবিধার্থে তাদের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়েছে। উত্তরকূটের যুবরাজ হিসাবে নাটকে তার আবির্ভাব হলেও দাদামশাই বিশ্বজিতের কাছ থেকে সে জেনেছিল তার জন্মরহস্যের কথা। মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন ঘরছাড়া মা তাকে জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। রাজা রণজিৎ তার কপালে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। মুক্তধারার কোলে তার জন্ম বলে সে সর্বদা তার স্রোতকে অন্তরে অনুভব করে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের তৃষ্ণা এবং চাষের জল বন্ধ করতে যন্ত্ররাজ বিভূতি বিকট লৌহযন্ত্রের নির্মাণে তার গতিরোধ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র বৈশ্যতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে রাজকার্য নির্বাহ করতে চায় বলে বিভূতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে গেছে রণজিৎ। যন্ত্রদানবের এই ক্রুদ্ধ আস্ফালনকে নিপাত করতে অভিজিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উত্তরভৈরবের মন্দিরের চুড়া আজ ঐ কদাকার যন্ত্রের সামনে ঢাকা পড়ে গেছে। সুতরাং দেবতা-মানুষকে বাঁচাতে হলে অভিজিৎকে এগিয়ে আসতে হবে। উত্তরকূটের যুবরাজ হয়েও অভিজিৎ শিবতরাইয়ের প্রজাদের কাছে পূজনীয়। এজন্য উত্তরকূটের প্রজারা তাকে রাজবিদ্রোহী মনে করে নিজ হাতে বিচার করতে চায়। রাজার হৃদয়ে শুরু হয় এক চরম দ্বন্দ্ব। একদিকে সন্তান হিসাবে আশ্রিত প্রাণাধিক

অভিজিৎ, অন্যদিকে রাজ্য। সুতরাং সে উন্মুক্ত উত্তরকূটের প্রজাদের হাত থেকে অভিজিৎকে বাঁচাতে কারাগারে বন্দী করে তাকে। শিবতরাইয়ের সন্ন্যাসী ধনঞ্জয় অহিংস আন্দোলনে অধিকার আদায়ের দাবী জানায়। মার খেয়ে মার জয় করার মন্ত্র শেখায় প্রজাদের। উত্তরকূট এবং শিবতরাইয়ের প্রজাদের মধ্যে যে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছে নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করলেন না। অভিজিতের কাছে উভয় প্রদেশের প্রজারাই সমান। কেবল অন্যায়-অত্যাচারের শিকার বলে শিবতরাইয়ের প্রজাদের বাঁচাতে তিনি রাজবিদ্রোহী প্রতিপন্ন হয়েছেন। বিশ্বজিতের কৌশলে কারামুক্ত অভিজিৎ শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি আনতে আর বাঁধের কারণে বন্ধ স্রোতধারার পথ উন্মোচন করতে মুক্তধারার পথে অগ্রসর হয়।

আলোচ্য নাটকের আশ্রিত চরিত্র অভিজিৎ রবীন্দ্রমননকে প্রতিষ্ঠা করে গেল প্রাণের মূল্যে। যে ধারার কোলে তার জন্ম সেই ধারার বদ্ধ প্রবাহ মুক্ত করে সে যেন জন্মঋণ শোধ করে গেল। উত্তরকূটের সিংহাসন তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য মানুষ। তাই আশ্রিত চরিত্র হয়েও হৃদয়ের মহত্ত্বে সকল আশ্রয়জাল মৃত্যুতে ছিন্ন করে প্রজাদের জন্য মঙ্গলের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছিল সে। আর তাতে সার্থকতা পেয়েছিল ভৈরবপন্থীদের স্তুতি।

এখন 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের আলোচনা করে নাটকের ধারায় প্রসঙ্গটির আলোচনা সমাপ্ত করা যাক। 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩৩) নাটকখানি নাট্যকারের 'শেষের রাত্রি' ছোটগল্পের কিছু চরিত্রের গ্রহণ-বর্জনের ভিন্ন রূপ। এখানে পাঁজরের ব্যথায় ব্যথাক্রান্ত, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের গল্প বর্ণিত হয়েছে। নাটকে যতীন, হিমি (বোন) এবং স্ত্রী মণি যতীনের মাসির আশ্রয়ে বাস করে। কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যতীন এবং হিমি পিতৃমাতৃহীন হয়ে মাসির আশ্রয়ে বড় হয়েছে। যতীনের পিতা কেদারবাবু যতীনের মাতামহের বাড়ীতে থেকে মেডিকেল কলেজে পড়ে। সেইসময় যতীনের মায়ের সঙ্গে কেদারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু মাতামহ এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। পাঁচ বছরের দীর্ঘ সাধনার অবসানে যতীনের মা তাকে স্বামী হিসাবে পান। মাতামহের অনিচ্ছায় এই বিবাহ সংঘটিত হয় বলে তিনি তার সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করে অন্য মেয়েকে (মাসিকে) সব দিয়ে যান। উদারমনা মাসি তার সব বিষয়-আশয় রুগ্ন যতীনের ভোগে ঢেলে দিচ্ছেন। যতীন মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত নিঃশেষ করে মণিসৌধ নির্মাণ করে যাবে। স্ত্রী মণি স্বামীর প্রাণের ভালোবাসার খবর রাখে না। রুগ্ন স্বামীকে ফেলে গাছ, জন্তু, জানোয়ারদের নিয়ে পড়ে থাকে। তাচ্ছিল্য এবং উদাসীনতায় তাকে এড়িয়ে চলে। চরম মুহূর্তে যতীনকে ফেলে বোনের অন্নপ্রাশনে সীতারামপুর চলে যেতে তার বাধে না। হিমি, মাসী তাকে মণি সম্পর্কে নানাভাবে ভুলিয়ে রাখে। ক্রমে সে বুঝতে পারে তার অবস্থা সম্রাট সাজাহানের মতোই —

> *'এখন মনে হচ্ছে, আমার যেন সেই শাজাহানের মতোই হল — আমি ক্ষীণ জীবনের এপারে — সে পূর্ণ জীবনের ওপারে — অনেক দূর, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না'।*

সমস্ত বিকিয়ে সে মনের মাধুরী মিশিয়ে মণিসৌধ নির্মাণ করে চলেছে। তার সাজসজ্জা কোথায় কেমন হবে ঠিক করছে। অথচ মণি তার মূল্য না বুঝে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। হিমির কণ্ঠে যেন বাস্তব সত্যের প্রতিধ্বনি — 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি'। মৃত্যুপথযাত্রী যতীন বোনের বিয়ের খরচের ব্যবস্থা করে বাকী সব মণিকে উইল করে দেয়। এজন্য মাসীকে সে সান্ত্বনা বাণী শোনালে মাসী বলে — সে ঢের পেয়েছে। নিঃসন্তান মাসীর কোলে যতীন আলো করে আছে এই তার অনেক পাওয়া।

এমন উদারমনা মাসীকে পেয়ে যতীন ধন্য। তাই তার বাসনা পরজন্মে তাকে মেয়ে হিসাব লাভ করা। ওদিকে মণি সম্পর্কে মাসী, হিমি যে যতীনকে ভুলিয়ে চলেছে আজ তা স্পষ্ট হয় বাড়ীর চাকরের কথায়। মণি সম্পর্কে বোন বা মাসি যে কেন তাকে ভুলিয়ে চলেছে তা যতীন বোঝে বলে তাদের প্রতি রাগ করে না। মণির প্রতিও তার রাগ নেই। কেবল রয়েছে অভিমান। এখানে কোন প্রতিবাদের ধ্বনি আমরা শুনতে পাই না আশ্রিতের কণ্ঠে। যা শোনা যায় তা অভিমানের ধ্বনি। চরম সময় এলে যতীন পাড়ি দেয় বিশ্বদেবতার চিরন্তন গৃহে প্রবেশের পথে। আজ মণি অনুতপ্ত। সে এসে যতীনের চরণ জড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। যতীনের গৃহে একদিন যতীনকে ছাড়াই তাকে গৃহপ্রবেশ করতে হবে। যতীন যে মরণের সাগরপারে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। হিমি গেয়ে ওঠে —

ওই মরণের সাগরপারে চুপেচুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে।

রবীন্দ্র গল্পের প্রেক্ষিতে বিষয়টির দিকে সামান্য আলোকপাত করলে দেখা যায় হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮?) গল্পে উলাপুর গ্রামে নবনিযুক্ত শহুরে পোস্টমাস্টার তার অনভ্যস্ত অস্বস্তিকর পরিবেশের একাকীত্বতা কাটাতে পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদ্র বালিকা রতনকে আশ্রয় দিয়েছিল। রতন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে থাকতে থাকতে বিচিত্র নারী হৃদয়ের আকাঙ্খা স্বরূপ তাকে ভালোবেসে ফেলে। পোস্টমাস্টারের কাছে এ সত্য অনাবিষ্কৃত থাকে। বদলির সময় রতনের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুরক্ষিত করতে কিছু অর্থ তার হাতে দিয়ে আসতে চায়। ক্ষুদ্র হলেও রতনের নারীসত্ত্বা তাতে অপমানিত বোধ করে।

তার পা জড়িয়ে ধরে বলে — 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।' প্রেমের অধিকারে তার এই অভিমান প্রকাশ। একথা না বুঝে পোস্টমাস্টার দেশে ফেরে। ফেরার পথে একবার ভাবে ফিরে যাই। পরক্ষণেই দার্শনিক উপলব্ধিতে আত্মসান্ত্বনা— 'ফিরিয়া ফল কী! পৃথিবীতে কে কাহার।' বালিকা ক্ষুদ্র হলেও, বালিকার এই প্রেমাকর্ষণ সে হয়তো ভুলতে পারবে না কখনো। রতনের আশ্রয় খন্ডিত হলেও, প্রেমাস্পদকে ধরে রাখার যে ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রচেষ্টা তা ব্যর্থ হলেও নায়ক সেখানে ব্যর্থ নায়ক , সুযোগসন্ধানী নায়কে প্রতিপন্ন হয়েছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১২৯৮, সাধনা) গল্পে রাইচরণকে আশ্রিত বলা যাবে না। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনার দায় নিয়ে সে যেভাবে নিজপুত্রকে আর্কেটাইপাল ইমেজে মনিবের পুত্রের পরিচয়ে স্থাপিত করে গেল, তাতে তার হৃদয়ের মহানুভবতার পরিচয় মেলে। ঘটনাটি নাটকীয় হলেও ফেলনার নবকুমার হিসাবে মনিবের গৃহে স্থান মেলে। মনিবের চোখে সে নিজ সন্তান হিসাবে অধিষ্ঠিত হলেও পাঠক জানে প্রকৃত সত্য। সুতরাং পাঠকের বিচারে সে আশ্রিত। অথচ তার এই পরিচয়টি মনিব এবং তার স্ত্রীর কাছে চিরকাল অধরা থেকে যাবে। এসব কথা বলার ঊর্দ্ধে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে রাইচরণের মহত্ব এবং উদারতা। নিজের হৃদয় ছিঁড়ে সে মনিবের ভাঙা হৃদয় গড়ে দিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে যে অতিপ্রাকৃত রসের সঞ্চার ঘটে তা এক হৃদয় বিদারক নিদারুণ কাহিনীর প্রচ্ছদপট। যজ্ঞনাথ কুন্ড তার সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রাচীন এক ভৌতিক পদ্ধতি 'যখ দেওয়া'র বিষয়টি এখানে সংঘটন করলেন। বাস্তবিক, না জেনে নিতাই নামক যে বালকটিকে তিনি মাটির নীচে মন্দিরের সুড়ঙ্গে সম্পদ রক্ষার জন্য রেখে এলেন সে তারই পৌত্র গোকুল। নিজের ঘরছাড়া ছেলে বৃন্দাবনের পুত্র। নিতাইকে নিজের প্রয়োজনে তিনি আশ্রয় দিলেন। তার গোকুল পরিচয় জ্ঞাত হলে এই নির্মম আচরণ তিনি করতে পারতেন না। অনুশোচনাটুকু তার অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। খন্ড আশ্রয়চিত্রে লেখক এখানে তার নির্মম পাশবিকতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন। 'দালিয়া' (১২৯৮, সাধনা) নামক হাস্যরসের গল্পে একান্নবর্তী পরিবারের দারিদ্য, স্ত্রীজনিত কারণে গৃহত্যাগ, নাকাল হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীতে হাস্যরসের ছটা যতটুকু থাক না কেন রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলেছেন — বৈরাগ্য সাধনে নয়, সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মাঝেই মহানন্দ লাভ করতে হয়। তার মধ্যেই লাভ করা যায় মুক্তির স্বাদ। ফকিরচাঁদের ক্ষুদ্র আশ্রিত জীবনের উপলব্ধিতে সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার। 'কঙ্কাল' (১২৯৮, সাধনা) গল্পের অশরীরী আত্মার প্রাক্তন জীবনের কাহিনী বর্ণনে দেখা যায় কঙ্কাল জীবিত জীবনে বয়সজনিত কারণে স্বামী এবং প্রেমকে আতঙ্ক মনে করতো। বিধবা হয়ে দাদার গৃহে আশ্রয় নেবার পর দাদার বন্ধুকে সে ভালোবেসে ফেলে। এখন স্বামী বা তার প্রেম তার কাছে আকাঙ্ক্ষার বিষয়। দুটি ক্ষেত্রেই মূল হল বয়স। কিন্তু পণের লোভে ডাক্তার প্রেমাস্পদ অন্যত্র বিবাহ করতে স্থির করলে নায়িকা তাকে বিষপানে হত্যা করে। সুতরাং এই আশ্রয়চিত্রে সমকালীন কুপ্রথা পণপ্রথা নামক সামাজিক এক ব্যাধিকে আক্রমণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' (১২৯৯, সাধনা) গল্পখানিতেও কিছু ভৌতিক রসের পরিবেশন হয়েছে। স্বাভাবিক বোধে মৃত বলে ঘোষিত কাদম্বিনীকে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দাহকারীদের পলায়ন, কাদম্বিনীর অসাড় দেহে পুনরায় হৃদস্পন্দনের প্রত্যাবর্তন, একাকীত্বতা ও বিপন্নতাবোধসহ শ্রীপতি বাবুর গৃহে তার আশ্রয় এবং আতঙ্কজনক আচরণ, পুনরায় ভাসুরপুত্র সতীশের টানে রানীহাটের শারদাশংকরের গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীতে নানা ভৌতিক রস পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে 'Somnambulism' বা 'doppelganger' ইত্যাদি নানা লৌকিক বিশ্বাস যা আতঙ্কজনক তা এখানে প্রকাশিত বলে মনে হয়। সবশেষে তার নিজের জীবন্ত সত্ত্বার পরিচয় দিতে তাকে পুষ্করিনীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মরতে হয়েছে — 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' আত্মহত্যায় সে সকল বিপন্নতাবোধের নিবৃত্তি করেছে। 'ছুটি' গল্পে গল্পকার ফটিকের মামাবাড়িতে আশ্রয়, বালকের স্বাধীনবিহারী জীবনের বাধা, মামীর নির্যাতনের কাহিনীকে আবেগপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। মায়ের প্রতি প্রবল অভিমানে তার এই অনিচ্ছুক আশ্রয় বন্ধনকে খন্ডন করে সে শেষ বাক্যে মাকে শুনিয়েছে — 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' (১২৯৯, সাধনা) গল্পটিতেও একটি আশ্রয়প্রসঙ্গ আছে। আর সেই আশ্রয়প্রসঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক এক কুপ্রথাকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আশ্রিত রাজীবলোচন, বিধবা হয়ে সহমরণে যাওয়া এবং দৈবঘটনাতেঅর্ধদগ্ধ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনকারিণী মহামায়াকে প্রেমের শক্তিতে ও মানসিক দৃঢ়তায় শর্তসাপেক্ষে লাভ করে। অধিক কৌতূহলবশত সে শর্তকে নিজে খন্ডন করলে মহামায়াকে সে চিরতরে হারিয়েছে। এ বেদনা তার অবশিষ্ট জীবনেরও সঙ্গী হবে সত্য, কিন্তু তার পূর্বে আশ্রিত হয়েও যে মানসিক দৃঢ়তায় সে মহামায়াকে গ্রহণ করেছিল তাতে সেই সহমরণ, কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে (১৩০১, সাধনা) সমকালীন বিধবা নারীর সংস্কার বিশ্বাসে আঘাত করা হয়েছে। মৃত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী নিঃসন্তানা জয়কালীর গৃহে তার

ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় পুলিন ও নলিন আশ্রয় লাভ করে। সংস্কারমনা, ছুতমার্গে বিশ্বাসী জয়কালীর ঠাকুরবাড়ী বালকদ্বয় তথা অন্যদের কাছেও সহজে প্রবেশের জায়গা নয়। শেষ পর্যন্ত সেখানে বরাহ এবং সুরাপানে উন্মত্ত ডোমেরা প্রবেশ করলে জয়কালীর দীর্ঘজীবনের সংস্কার-বিশ্বাস বিচলিত হয়। তিনি অনধিকারে প্রবেশিত অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিলেও ডোমদের কড়া নির্দেশে শোনালেন — 'যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।' 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' প্রহসনের মতো আশ্রিত মূঢ়, অবিবেচক ঘরজামাতাদের মানসিকতাকে আঘাত করেছেন। 'দিদি' (১৩০১, সাধনা) গল্পে ক্ষুদ্র ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষার্থে স্বামীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে। পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদ্র বালক নীলমণিকে এবং তার সম্পত্তিকে স্বামী জয়গোপালের নিষ্ঠুরতা এবং লোভ থেকে বাঁচাতে দিদি যে চেষ্টা করেছে তাতে তার হৃদয়ের শক্তি, উদারতা এবং স্বামীর অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদী নারীচরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। ভাই তার স্নেহের আশ্রিত আর স্বামী তার ভাইয়ের সম্পদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি। ভাইয়ের সম্পত্তি থেকে স্বামী নিজের ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করলেও সম্পূর্ণটুকু গ্রাস করার লোভে নিষ্ঠুর পাশবিক আচরণের মত্ত হয়েছিল। তার এই পাশবিকতাকে প্রতিবাদ করে ভাইকে বাঁচাতে চেয়েছিল দিদি। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' (১৩০৩, সাধনা) গল্পের তারাপদ নিজের গুণে বারবার নিজের জন্য আশ্রয় রচনা করেছে। আবার নিজেই তা খন্ডন করে দূরে পাড়ি জমিয়েছে। বন্ধনভীরু এই হরিণ শিশু সুদূরের আহ্বানে বারবার বন্ধন ছিঁড়ে রবাহুত অতিথি হয়ে প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে সামিল হয়েছে। স্নেহ-প্রেমের ষড়যন্ত্র বন্ধনকে ছিন্ন করে সে গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রকৃতির স্নেহাকর্ষণের চিরন্তন সত্য ও কপটহীনতাকে। এই সামগ্রিক আলোচনায় দেখানো গেল রবীন্দ্র নাটক এবং ছোটগল্পে আশ্রয়প্রসঙ্গটি কখনো প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে কাহিনীর রসনিষ্পত্তি ঘটিয়েছে।

গ্রন্থঋণ :

আকর গ্রন্থ :

১) 'গল্পগুচ্ছ', চারিখন্ডের সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭।
২) রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ (প্রথম, দ্বিতীয় খন্ড), প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', সংশোধিত ও পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।
২) ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা', পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৫, কলকাতা-৭৩, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
৩) ঘোষ তপোব্রত, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ', সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, বাইশে শ্রাবণ-১৪১০, আগষ্ট ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

*****